মূল্যবৃদ্ধি শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান

জনজীবনের সর্বাত্মক সংকটের সমাধান কোন্ পথে?

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির আঘাতে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশের মানুষ এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে, সারা বিশ্বের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্তদের ৩ ভাগের ১ ভাগ মানুষ ভারতীয়, এবং আন্তর্জাতিক দারিদ্র সীমার নীচে এদেশের ৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ২৮.৮.২০০৮)। এর মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের অভুক্ত মানুষের সংখ্যা ভারতের সব রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ৬২ বছরের স্বাধীন এই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সারা দেশ যেমন এই অবস্থায় পৌঁছেছে, তেমনই ৩২ বছরের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের পরিচালনায় এই রাজ্য দারিদ্র, ক্ষুধা, কর্মহীনতা, বেকারির ক্ষেত্রে সারা দেশের মধ্যে প্রায় সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। এর মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। শ্রমিকদের জীবনে অন্ধকার, তাদের মাথার ওপর ছাঁটাইয়ের খড়্গ। বেকার যুবকদের হাহাকার। ফসলের দাম না পেয়ে চাষীর আত্মহত্যা এ রাজ্যেও নতুন ঘটনা নয়। এর মধ্যেই চলছে কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকারি নেতাদের মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির বন্যা।

মাত্র কয়েক মাস আগে কংগ্রেস পরিচালিত ও সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকার নিজেদের সাফল্য জাহির করতে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন', 'উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি

(GDP) ও নিম্নহারে মুদ্রাস্ফীতির' প্রচারের রঙিন ফানুস উড়িয়ে ছিল। আচমকা সেই ফানুস ফেটে যাওয়ায় তারাই এখন উচ্চহারে মুদ্রাস্ফীতি ও নিম্নহারে প্রবৃদ্ধির জন্য একটা গ্রহণযোগ্য অজুহাত কোন প্রকারেই দাঁড় করাতে পারছে না। মুদ্রাস্ফীতির হার ১২ শতাংশের বেশি অথচ জিডিপি বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশের কাছাকাছি। এর অর্থ বুর্জোয়া অর্থেও উন্নয়ন নয়, ৫ শতাংশের বেশি অবনমন। কিছু বস্তাপচা বাঁধা বুলির আশ্রয় নিয়ে বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রল-ডিজেলের দামবৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন হ্রাস, ইত্যাদির সঙ্গে টাকার যোগান বৃদ্ধির দোহাই সরকার দিচ্ছে এবং বলছে এগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নাকি এগুলি মালিক স্বার্থে নেওয়া সরকারি নীতিরই কুফল।

খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য, কিন্তু চাষী ফসলের দাম পাচ্ছে না

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী বেসরকারি মালিকদের স্বার্থে সরকার কৃষিপণ্যের সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থা, যা ইতিমধ্যেই দুর্নীতিগ্রস্ত ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে, তাকে পুরোপুরি তুলে দিচ্ছে। এদেশের বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ নিশ্চিত না করেই গম, দানাশস্য, চাল, চিনি ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করার অনুমতি দিয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে ধীরে ধীরে গণবণ্টন ব্যবস্থা (রেশন) তুলে দিয়েছে। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির কাছে খুচরো ব্যবসার দ্বার খুলে দিয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের সহায়তায় মজুতদারি ও কালোবাজারি চালাবার ঢালাও ব্যবস্থা করেছে। বেশি মূল্যে খাদ্য আমদানি করছে এবং 'ডেরিভেটিভ ট্রেডিং'এর নামে অত্যাবশ্যক পণ্যের ফাটকা কারবার চালানোর অনুমতি দিয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, দুঃস্থ মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে যখন মজুতদার মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের দুঠের সুযোগ দিতে রেশন তুলে দিচ্ছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোট, মার্কসবাদী বলে দাবিদার সি পি এম প্রভৃতি দলগুলি তখন ইউ পি এর পক্ষে ছিল। অথচ তারা ইউ পি এ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য কমাবার, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য, এমনকী যে গণবণ্টন ব্যবস্থাকে (রেশন) তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সেই গণবণ্টন ব্যবস্থা চালু রেখে তাকে সম্প্রসারিত করার জন্য কোন চেষ্টাই করে নি। বরং যেখানে তারা ক্ষমতায় আছে সেখানে তারাই খাদ্য সংগ্রহ, বণ্টন ও খুচরো ব্যবসাকে বৃহৎ বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া এবং কালোবাজারি, মজুতদারি, স্বজন-পোষণ ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মতো একই ধরনের নীতি

নিয়ে চলছে। ফলে চাষীর ফসল অল্প দামে লুঠে নিচ্ছে অতি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা, চাষী আত্মহত্যা করছে — অথচ মানুষের মুখের গ্রাস অগ্নিমূল্যে বেচে মুনাফার পাহাড় তৈরি হচ্ছে — তাই রেশন বন্ধ করা হয়েছে, যাতে সহজে লুঠের ব্যবসা চালানো যায়।

মুদ্রাস্ফীতি ও বিশ্বায়ন

দীর্ঘদিন চরম পুঁজিবাদী শোষণ ও পুঁজিবাদের স্বার্থে গৃহীত নয়া আর্থিকনীতি এবং বিশ্বায়নের বিষময় ফল হিসেবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। চাল, ডাল, আটা, ভোজ্যতেল, কাঁচা সব্‌জি সহ সব ধরনের খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে চলেছে। এবং এই বেড়ে চলার ওপর লাগাম পরানোর কোন চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। দেশবাসী, বিশেষ করে গরিব ও সাধারণ মানুষ বিপন্ন ও দিশাহারা হয়ে পড়ছেন। কেন এমন হচ্ছে? তাই নিয়ে, কি কেন্দ্র কি রাজ্য, কোনও সরকারের কোন পরিষ্কার বক্তব্য নেই। রাজ্য দেখাচ্ছে কেন্দ্রকে, আর কেন্দ্র বিশ্ববাজারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির দোহাই দিচ্ছে। এটা অনেকেই জানেন যে ভারত খুব বেশি খাদ্য আমদানি করেনা। কাজেই বিশ্ববাজারে খাদ্যের দামবৃদ্ধির দোহাই দেওয়া একটা নিকৃষ্ট প্রতারণা। আর একটা সাবেকি যুক্তি তোলা হচ্ছে, তা হল, মুদ্রাস্ফীতির জন্যই এটা ঘটছে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে একথা ঠিক, কিন্তু কেন ঘটছে? পুঁজিবাদী শোষণের ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমছে, বাজারে চাহিদা কমছে। এই সংকট থেকে পুঁজিবাদকে বাঁচাতে সরকার টাকার জোগান বাড়িয়ে কৃত্রিমভাবে চাহিদা বাড়াবার যে চেষ্টা করছে তা থেকেই দেখা দিচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি। কিন্তু এই মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে? সরকার না সাধারণ মানুষ? মুদ্রাস্ফীতির কারণই বা কী? পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়মের কষ্টিপাথরে বিশেষজ্ঞ মহলের নানা বিশ্লেষণ এবং সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলি খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পুঁজিপতিদের স্বার্থে নেওয়া সরকারি নীতিই মুদ্রাস্ফীতির জন্য প্রধানত দায়ী।

মুদ্রাস্ফীতির পিছনে টাকার বাড়তি যোগান

এই পুস্তিকা লেখার সময় দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ১২ শতাংশের উপরে যা গত ১৬ বছরের মধ্যে সর্বাধিক। সাধারণভাবে তার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, বাজারে টাকার যোগান লাগামহীনভাবে বেড়েছে। টাকার যোগানবৃদ্ধির পিছনে

রয়েছে প্রধানত দেশবিদেশের নানা ধরনের লগ্নী, কালো টাকা ও গৌণত ফাঁপাই নোটের বৃদ্ধি। বাজারে টাকার যোগান বাড়ছে প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নিয়ম অনুযায়ী দেশের পুঁজির বাজার বিদেশের সামনে খুলে দেওয়ায় ফাটকা শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ আসছে বিপুল হারে। কারণ, ভারতের ফাটকা বাজারে লাভ বেশি। কেবল ২০০৭ সালেই শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ২০,০০০ কোটি ডলারের কিছু বেশী (৪৫ টাকা প্রতি ১ ডলার ধরলে ৯ কোটি টাকা)। তার ওপর বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী সরকার একচেটিয়া কোম্পানিগুলির বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ নেওয়ার রাস্তা অবাধ করেছে। দেখা যাচ্ছে, ঐ সুযোগে নিজেদের পুঁজির জোর বাড়িয়ে মুনাফা বাড়াবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ নিয়েছে ক্রমবর্ধমান হারে। তার হিসেবটা এরকম ঃ ২০০৫-০৬ জানুয়ারি থেকে মে মাসে ৩৪০ কোটি মার্কিন ডলার, ২০০৬-০৭ জানুয়ারি থেকে মে মাসে ১০৮০ কোটি ডলার, ২০০৭-০৮ ঐ একই জানুয়ারি থেকে মে মাসে ১৫৩০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৬৪২৬০ কোটি টাকা (দ্রঃ দি স্টেটসম্যান, ৩-০৭-০৮)। টাকার দাম কমায় যা এখন বেড়ে হয়েছে ৬৮,৮৫০ কোটি টাকা। তাহলে এই বিদেশি বিনিয়োগ ও বিদেশি বাণিজ্যিক ঋণ — এই দুই খাতের বিপুল পরিমাণ টাকা দেশের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির কারণ নয় কি?

দ্বিতীয়ত, টাকার যোগান বাড়ছে কালো টাকার অবাধ বৃদ্ধির কারণে। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ যে দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে তার একটা কুফল হিসাবে এদেশে কালোটাকার একটি সমান্তরাল শক্তিশালী অর্থনীতি চালু আছে। এই কালো টাকার পরিমাণ কত — তা সরকার জানেও না, জানার চেষ্টাও করেনা বা এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাও নেয়না। বছর চল্লিশেক আগে ওয়াংচু কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছিল তা ছিল খুবই আতঙ্কজনক। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার কিছুই করেনি। বলাবাহুল্য, এ নিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সরকারি বহু মন্ত্রী-আমলা-বড় বড় ব্যবসায়ী, রুই-কাতলারা জালে পড়ে যাবে। বরং সরকারি নীতির ফলে কালোটাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় দীপক বসুর প্রবন্ধে (৩.০৭.০৮) বলা হয়েছে, সরকার ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা প্রাপ্য কর সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু আমরা জানি কর আদায় করতে না পারার কোন কারণ নেই। আসলে সরকার কর বকেয়া ফেলে রেখেছে। এই

অনাদায়ী কর কালো টাকার বাজারকে স্ফীত করছে। সরকার যে এই অপকর্মটা একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থেই করছে — এটা গোপন করেছে। সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য এই সত্যটা চাপা দিয়ে তারা বলার চেষ্টা করছে — বাজারে আগুন তো লাগবেই, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের বেতন কত বেড়েছে। তারা যেটা চেপে যাচ্ছে, তাহল, বাজার দর বাড়লে আইনমাফিকই মহার্ঘভাতা সরকারকে বাড়াতে হয়। তবে যতটুকু বেতন বাড়ে বাজারদর বাড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া অঙ্কের হিসাব করলেই দেখা যাবে, সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা কম বলে শুধু নয়, এদের যতটা বেতন বেড়েছে তা গোটা অর্থনীতির তুলনায় অতি সামান্য। ১১৫ কোটিরও বেশি মানুষের এই দেশে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ। তাদের সাম্প্রতিক দু-দফায় বেতনবৃদ্ধির যাবতীয় হিসাব ধরলে খরচ বাড়বে ৩০,৩৬৭ কোটি টাকা। অথচ এক বছরেই যাবতীয় অনাদায়ী বকেয়া করের পরিমাণ এর প্রায় চারগুণেরও বেশি। তাছাড়া দেশের ব্যাঙ্কগুলির অনাদায়ী ঋণের পরিমাণও দেড় লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই বিপুল পরিমাণ টাকা বাজারে এসে জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে।

সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি যে মুদ্রাস্ফীতির কারণ নয় তা বোঝা কঠিন নয় এজন্য যে, সরকার যখন ঢাক পিটিয়ে ভাব দেখাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি কমাবার জন্য বাজারে টাকার যোগান হ্রাস করার পদক্ষেপ নিচ্ছে, ঠিক তখনই ১৩ আগস্ট '০৮ সরকার আরেক দফা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছে। বেতন বৃদ্ধি যদি মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হত তবে নিশ্চয়ই সরকার সে পথে যেতো না।

তৃতীয়ত, সরকার নিজেও সরাসরি বাজারে টাকার যোগান বাড়াচ্ছে। নয়া আর্থিক নীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের একতরফা নানান স্বার্থ দেখার জন্য কর কমানো, কর ছাড় দেওয়া ও প্রাপ্য কর আদায় না করার ফলে খরচ অনুপাতে সরকারের আয় বাড়েনি। ফলে বাজেট ঘাটতি বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। উন্নয়নের ফানুস উড়িয়ে, ডাহা মিথ্যে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে তাকে ঢাকার উপায় নেই। এবছর বাজেটে সরকার বলেছিল, আর্থিক ঘাটতি ১ লক্ষ ৩৩,২৮৭ কোটি টাকায় বেঁধে রাখা হবে। অথচ সংবাদপত্রে প্রকাশ, বছরে প্রথম দুমাসের মধ্যেই ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭৩,২০১ কোটি টাকা। বাকি রয়েছে আরোও ১০ মাস। এই

ঘাটতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। দুমাসই যদি ৫৫ শতাংশ ঘাটতি হয়ে যায়, বছরের শেষে ৩-৪ লক্ষ কোটি টাকার ঘাটতি হবেনা, এটা কেউ হলপ করে বলতে পারে না। এখন প্রশ্ন হলো এই বিপুল ঘাটতি সরকার কীভাবে মেটাবে? সরকার ঘাটতি পূরণ করতে পারত, যদি সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে শক্তিশালী করত, গণবণ্টন ব্যবস্থা (রেশন) বা অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলিকে চালু রেখে, কর ও বকেয়া-কর আদায় করে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যথেচ্ছ লাভকে নিয়ন্ত্রণ করত। যদি এই উদ্যোগগুলি কঠোরভাবে নিতে পারত। কিন্তু সরকার সে সব করছে না। বরং ঘাটতি মেটাতে সরকার সহজ ও মূল্যবৃদ্ধির রাস্তাকেই বেছে নিচ্ছে। ঘাটতি মেটাতে সরকারকে আরো ধার করতে হচ্ছে এবং ফাঁপাই নোট ছাপতে হচ্ছে — এ দুটো রাস্তাই মুদ্রাস্ফীতির আগুনে আরো ঘি ঢালছে। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ, শিল্প প্রবৃদ্ধির হার গত বছরের তুলনায় কমেছে — যার মূল কারণ চাহিদার অভাব (দ্রঃ ইকনমিক টাইমস, ২৮.০৭.০৮)। অর্থাৎ জনগণের কেনার ক্ষমতার অভাব। অতএব বোঝা কঠিন নয় বাজারে চাহিদা কৃত্রিমভাবে বাড়াতেই সরকার টাকার যোগান বাড়াচ্ছে — যা মুদ্রাস্ফীতিকেও আরো বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ, বাজারে টাকার জোগান বৃদ্ধির কারণ এই নয় যে, সরকার অযোগ্য বা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাজারে টাকার জোগান বাড়ছে। আসলে পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে মন্দার বাজারকে কৃত্রিমভাবে চাঙ্গা করতেই তারা বাজারে টাকার যোগান বাড়াচ্ছে। অর্থাৎ উপরোক্ত তিন পথে সরকারই পুঁজিপতিদের স্বার্থে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাচ্ছে এবং দেশবাসীকে ডাহা মিথ্যা দিয়ে ঠকাচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম্ বলেছেন তাঁর উপর ভরসা রাখতে। গত ১৮ বছরের নয়া আর্থিক নীতিতে তাঁরা সাধারণ মানুষকে যেভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে, তাতে তাঁদের উপর ভরসা রাখা, আর বিড়ালকে মাছ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া — একই কথা। সরকার এবছরের আর্থিক সমীক্ষায় বলেছে বটে যে, বাজারে টাকার যোগান তেমন বাড়েনি। কিন্তু সেই হিসাব যে কতখানি জল মেশানো এবং মিথ্যাচার, তা পরিষ্কার হয়ে যায়। যখন দেখা যায় সরকার নিজের বানানো মুদ্রাস্ফীতি অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঋণের উপর সুদের হার বাড়িয়ে টাকার যোগান কমানোর চেষ্টা করছে। বাজারে টাকার যোগান না বাড়লে সরকার এই পথে যেতো না। আবার একসময়

চাহিদার মন্দা কাটাতে — টাকার যোগান বাড়াতে হচ্ছে। এই দু'মুখো উভয় সঙ্কটের মূলে রয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার শোষণ। আর পুঁজিবাদের স্বার্থে এই অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতিই বল্গাহীন মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।

খাদ্যে ফাটকাবাজী

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি কি নিছক মুদ্রাস্ফীতির জন্যই ঘটছে? সাধারণভাবে মুদ্রাস্ফীতির পরোক্ষ প্রভাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়তে পারে। যেমন ধরা যাক, পরিবহনের খরচ বাড়ার জন্য খাদ্যদ্রব্যের দাম কিছুটা বাড়তে পারে, কিন্তু জিনিষপত্রের দাম বর্তমানে যেভাবে হু হু করে বেড়ে চলেছে — এ দিয়ে তার পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। ৬০ টাকার ভোজ্য তেল ৮০/৯০ টাকা বা ডালের দাম প্রায় দ্বিগুণ হবার কথা নয়। অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়েছে একইভাবে। আসলে খাদ্যের দাম বাড়ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল, ভারতের খাদ্যের বাজারে শুধু মনসান্টো, কার্গিল বা অন্যান্য বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলিই নয়, আইটিসি, ব্রিটানিয়া, মহিন্দ্রা এ্যান্ড মহিন্দ্রা, রিলায়েন্স, গোদরেজ, দিল্লির ফ্লাওয়ার মিলের মতো দেশি বৃহৎ একচেটিয়া সংস্থাগুলিও জোরদার ফাটকা কারবার শুরু করেছে। কখনও কখনও দেশি-বিদেশি উভয় পুঁজিই হাত মিলিয়ে কাজ করছে।

বিশ্বায়নের ফতোয়া হল, খাদ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার থেকে সরকার সরে দাঁড়াবে এবং সবটা ছেড়ে দেবে খোলাবাজারের উপর, অর্থাৎ বাজারের নিয়ন্ত্রক বেপরোয়া মুনাফা লুণ্ঠনকারী একচেটিয়া পুঁজির উপর। বেসরকারীকরণের এই কর্মসূচি অনুযায়ী দরিদ্র জনগণকে খাদ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করার সরকারি দায়িত্বকে অতি-সেকেলে ও সমাজতন্ত্রের জের বলে উড়িয়ে দিয়ে সরকার দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে। খাদ্যদ্রব্যের যোগান কমার যুক্তিও ধোপে টেকে না। কারণ দেশে খাদ্য উৎপাদন কম হয়নি। ২০০৫ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টন, ২০০৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন। কিন্তু বাজারে সরকার না থাকায় বা সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আইটিসি, ব্রিটানিয়া, এডব্লু বি ইন্ডিয়া, দিল্লি ফ্লাওয়ার মিল-এর মতো বৃহৎ খাদ্য ব্যবসায়ীরা এ বছর ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ টন গম কিনে নিয়েছে এবং আরও কিনবে। যা তারা পরে চড়া দরে বেচবে। লক্ষ্মণীয় হল সরকারি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি ১২ শতাংশের আশপাশে হলেও, গম, চিনি ও নুনের দাম বাড়ছে ৩০ শতাংশের বেশি। (স্টেটসম্যান, ১২-

৯-০৮) গম, চিনি ও নুনের ব্যবসা প্রধানত একচেটিয়া পুঁজির হাতে। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে টাকার অঙ্কে আপাত মজুরিবৃদ্ধি বা ফসলের মূল্যবৃদ্ধি সামান্য পরিমাণে দেখা যাচ্ছে — কিন্তু প্রকৃত মজুরি ও ফসলের দাম ক্রমেই কমছে। অন্যদিকে ব্যাপক ছাঁটাই ও বিপুল বেকারির ফলে অধিকাংশ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমেই নামছে, বাজারে তীব্র মন্দা। মন্দার ধাক্কায় বাড়তি বিপুল পুঁজি যাচ্ছে খাদ্যদ্রব্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসায়। আজ বিলাসদ্রব্য সহ অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের বাজারে প্রবল মন্দার পরিস্থিতিতে পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা বন্ধ হওয়ায়, মুনাফার স্বার্থে পুঁজি যাচ্ছে খাদ্যদ্রব্য সহ সবধরনের ফাটকা কারবারে। দাম বাড়লে চাহিদা কমে — এটা একটা সাধারণ তত্ত্ব। সর্বত্র সমানভাবে এর প্রয়োগ ঘটে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য না কিনে যেহেতু উপায় নেই, তাই এসবের দাম যত বাড়ে, চাহিদা ততটা কমে না। কারণ মানুষ অন্য খরচ কমিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিলাসদ্রব্যে বা অন্য ভোগ্যপণ্যে ঘটে ঠিক উল্টো ঘটনা। বিলাসদ্রব্য না হলেও চলে, তাই তার দাম বাড়লে চাহিদা দ্রুত কমে যায়। চাহিদার স্থিতিশীলতার জন্য, অর্থাৎ নিশ্চিত বিক্রি ও নিশ্চিত মুনাফার জন্য বিলাসদ্রব্যের চেয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারটাই ফাটকাবাজদের কাছে বেশি আকর্ষণীয়। খাদ্যের বাজারে ফাটকাপুঁজির বেশি বেশি বিনিয়োগ এখন গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রবণতা। এদেশেও ২০০৪ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যদ্রব্যে ফিউচার ট্রেডিং-এর অনুমতি দিয়েছে। এর দ্বারা কম দামে কিনে তা মজুত করে পরে বেশি দামে বিক্রি করা আইনসম্মত হয়ে গিয়েছে। যার সুযোগ নিয়ে চলছে খাদ্য নিয়ে ব্যাপক ফাটকাবাজি। খাদ্য নিয়ে মজুতদারির পুরানো ট্র্যাডিশন আগের থেকেই ছিল। কিন্তু সেই কাজে বড়বাজারের গদী মালিক আগরওয়ালা-ঝুনঝুনওয়ালাদের যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত হতো, বর্তমানে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করছে একচেটিয়া ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী। ফলে মজুতদারির যুগে ফাটকাবাজির কুফল যা ঘটতো, এখন ঘটছে তার চেয়ে অনেক বেশি, ব্যাপক ও সর্বাত্মকভাবে।

অনেকে আবার অহরহ এমন যুক্তিও দিয়ে থাকেন যে, বাজারে তো মাল পড়ে থাকে না। সবই তো বিকোচ্ছে। ফলে জনগণের হাতে তো টাকার যোগান আছেই, ক্রয় ক্ষমতাও আছে, না হলে মাল বিকোচ্ছে কি করে?

জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশের হাতে বাড়তি কিছু টাকা এসেছে — একথা

যদি তর্কের খাতিরে সত্য বলে ধরেও নেওয়া যায়। তাহলেও তার জন্য খাদ্যের চাহিদা কতটা বাড়তে পারে? মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বাড়তি টাকা এলে টিভি, ফ্রিজ, এসি মেসিন, মাইক্রোওয়েভ, গাড়ি বা অন্য ভোগ্যপণ্য ও বিলাসদ্রব্যের চাহিদা কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু বেশি টাকা যার হাতে এলো, তার কি খিদে বেড়ে যাবে? আয় বাড়লে, যে মোটা চাল খায়, সে সরু চাল খেতে পারে। কিন্তু যে ২০০ গ্রাম চালের ভাত খায় সে কি টাকা আছে বলে ৫০০ গ্রাম/১ কিলো চালের ভাত খাবে? যারা টেনে টুনে তিন কিলো ভোজ্য তেল-এ মাস চালাতো — তারা বেতন বাড়লে বা টাকা হাতে এলে ৫/৬ কিলো তেল কিনতে পারে। কিন্তু ১০/২০ কিলো তেল তো তারা খাবেনা। অর্থাৎ খাদ্যের বাজারে আচমকা চাহিদাবৃদ্ধি ঘটে না। আচমকা চাহিদাবৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও তেলের দাম ৫৪-৬০ টাকা থেকে ৮০-৯০ টাকা হবে কেন? সকলেই দেখতে পাচ্ছেন, এখন ডাল, আটা, তেল সব কারবারেই একচেটিয়া পুঁজি ঢুকে পড়েছে। নুন পর্যন্ত বেচছে টাটা, তেল বেচছে আই টি সি, দুধ বেচছে ব্রিটানিয়া, শাক-সব্জী বেচছে রিলায়েন্স। খাদ্য ব্যবসা-এ একচেটিয়াকরণ এবং একচেটিয়া পুঁজির আওতায় মাত্রাছাড়া ফাকটাবাজি যে খাদ্যদ্রব্যের অকল্পনীয় মূল্যবৃদ্ধির কারণ তাকে আড়াল করার আর উপায় নেই। জনগণের মুখের গ্রাস লুঠেরাদের হাতে তুলে না দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি যদি জনসাধারণের দুর্দশা অনুভব করতো তাহলে তারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসাকে পুরোপুরি সরকারের হাতে তুলে নিয়ে 'পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য' চালু করতো — মজুতদারি ও ফাটকাবাজি থেকে খাদ্যদ্রব্যকে সরকারের হাতে এনে জনগণকে নির্দিষ্ট দামে সরবরাহ করতে পারতো। কিন্তু ক্ষমতার লোভ ও ব্যবসায়ীদের টাকার থলির কাছে বন্দী এই দলগুলি এটা করতেই পারে না।

পেট্রল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি

প্রবল মূল্যবৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত মানুষের উপর আবার একদফা পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চেপে বসেছে। পেট্রলে লিটার প্রতি ৫ টাকা, ডিজেলে লিটার প্রতি ৩ টাকা, রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা মূল্যবৃদ্ধি জনগণকে ভয়াবহ সংকটের মুখে ফেলেছে। এখন বিশ্ব বাজারে তেলের দাম ১৩৯ থেকে কমে ১০০ ডলার হওয়া সত্ত্বেও সরকার তেলের বা গ্যাসের দাম কমাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার ও বাজারি সংবাদপত্রগুলি এই মূল্যবৃদ্ধির পক্ষে ভাঙা রেকর্ডের মতো

যে সওয়াল করেছে তা হল 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে পেট্রো-পণ্যের দাম বাড়ানো ছাড়া তাদের উপায় নেই।' জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিবহন খরচ বেড়ে যায় — সব জিনিষের দাম বাড়তে থাকে। তাই বহু দেশেই এই দাম বাড়ানো বন্ধ রাখা হয় নানা পন্থায়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়লেই কোন একটি দেশের তেলের দাম বাড়াতে হবে এমন কথা অর্থনীতির যুক্তিতেও এখন আর খাটে না। যারা এই কথাগুলি বারবার বলে চলেছে, তারাও জানে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোপণ্যের দর ভারতের চেয়ে কম; অথচ সে দেশে তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুযায়ী সর্বদাই বাড়ে-কমে। সরকার ভর্তুকি দেয় না বরং ১৭ শতাংশ ট্যাক্স নেয়। তেলের দামও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না। অর্থাৎ খোলা বাজারের নিয়মেই পেট্রোপণ্যের দামের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও আমেরিকায় আমাদের দেশের তুলনায় তেলের দাম অনেক কম। চীন ও জাপানে তেলের ব্যবহার আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তেলের দাম ভারতের চেয়ে কম হয় কি করে? আবার তৈলভাণ্ডারহীন অত্যন্ত দুর্বল বাংলাদেশে পেট্রোপণ্যের দাম আমাদের চেয়ে কম হয় কি করে? আমাদের দেশেই বা তেলের দাম এত বেশি কেন? দেশের তেলের খনিজভাণ্ডার-এর তেল থেকেই একসময় দেশের চাহিদা ৭৫ শতাংশ পূরণ হত। বিশ্বায়নের পথ ধরে দেশের তেলের কূপগুলো দেশি-বিদেশি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া এবং তেল উত্তোলনের ব্যয় কম হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারের দরে বিক্রির অনুমোদন দেওয়ার ফলে তারা ব্যাপক মুনাফা করছে, এর উপর আছে সরকারের চাপানো নানা ধরনের কর। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য সাথে সাথে দেশে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করার কোন যুক্তি নেই। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম বাড়লে তেল কোম্পানিগুলির বিরাট লাভের অঙ্ক কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু তাদের লোকসানের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলির পাশাপাশি সরকারি কোম্পানিগুলিও বর্তমানে দেশের বাইরে তেলের খনিতে বিনিয়োগ করছে, এমনকি বিদেশের তেল কোম্পানি কিনেও নিচ্ছে। প্রত্যেক বছরে তাদের লাভের অঙ্ক স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছে। তেল ব্যবসায়ী রিলায়েন্স কোম্পানির মুনাফার হিসাবটা দেখা যাক।

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের লাভের পরিমাণ

২০০৪-০৫ সালে	৭,৫৭২ কোটি টাকা
২০০৫-০৬	৯.০৬৯
২০০৬-০৭	১১,৯৪৩
২০০৭-০৮	১৫,৫৪৬

(সূত্রঃ রিলায়েন্সের বিভিন্ন বছরের বার্ষিক রিপোর্ট)

রিলায়েন্সের রপ্তানি

০০৪-০৫ সালে	২৫,৫৩২ কোটি টাকা
২০০৫-০৬	৩২,৬৯১
২০০৬-০৭	৬৬,৬২৭

ও এন জি সি-র লাভ

২০০৬-০৭	১,৬০৩ কোটি টাকা
২০০৭-০৮	২,৩৯৭

(সূত্রঃ ও এন জি সি-র ওয়েবসাইট)

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির জন্য তেল কোম্পানিগুলির লোকসান হয় এটা তর্কের খাতিরে মেনে নিলে বছরে বছরে তাদের লাভের অঙ্ক হাজার হাজার কোটি টাকা বাড়ছেই বা কি করে তার জবাব দিতে হবে? আর তারা বিদেশে তেল খনিতে বিনিয়োগ করছে কি করে? আর বিদেশে তেলের কোম্পানিগুলোকে কিনছেই বা কি করে?

বাস্তবে আমাদের দেশের দেশিয় তেল কোম্পানিগুলির ও সরকারের বিপুল আর্থিক ভাণ্ডার গড়ে তোলার স্বার্থে তেলের ওপর নানা ধরনের ট্যাক্স ও সেস বসিয়ে দাম বাড়ানো হয়। সিপিএম মদতপুষ্ট ইউ পি এ সরকারের জনবিরোধী মূল্যবৃদ্ধির নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করার পথ না নিয়ে সিপিএম এ রাজ্যে লোকদেখানো মামুলি প্রতিবাদ করে জনগণকে ধোঁকা দিতে চেয়েছে। অথচ পেট্রল, ডিজেল ও বিশেষত রান্নার গ্যাসের ওপর রাজ্য সরকারের চাপানো বিক্রয় কর ও সেস কমিয়ে মূল্যবৃদ্ধিকে যতটা তারা রোধ করতে পারতো, সেটা তারা করেনি।

গ্যাসের দাম

রাজ্য	সরকার	টাকা
দিল্লি	কংগ্রেস	২৯৪.৭৫
মহারাষ্ট্র	কংগ্রেস	৩৩৪.০০
ঝাড়খন্ড	ইউপিএ সমর্থিত	৩১৬.৭৫
গুজরাট	বিজেপি	৩৪৭.৭০
হরিয়ানা	কংগ্রেস	৩৩৩.০০
উত্তরপ্রদেশ	বিএসপি	৩৩৩.৪৫
কর্নাটক	বিজেপি	৩৪৮.০৪
পশ্চিমবঙ্গ	সিপিএম	৩৫০.৪৫

পশ্চিমবঙ্গে গ্যাসের দাম বেড়েছে সর্বাধিক। উপরন্তু, বাসমালিকরা ভাড়া বাড়াবার দাবি তোলার আগেই সিপিএম সরকার পরিবহন ভাড়া অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। যাত্রীরা যাতে অসহায়ভাবে ভাড়াবৃদ্ধি মেনে নিতে বাধ্য হয় সেজন্য বাস মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সিপিএম নেতারা বাস বন্ধ করায়। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য শব্দটাও এই সরকার ব্যবহার করে শুধু অস্বাভাবিক ভাড়াবৃদ্ধিকে গ্রহণযোগ্য করার অজুহাত হিসাবে। যাত্রীদের কথা কোনদিনই ভাবা হয়নি। দেশের বহু রাজ্যে বাস চলে ন্যূনতম স্তরে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক বা একতৃতীয়াংশ ভাড়ায়। দু একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গে পরিবহনের ভাড়া সর্বাধিক। এর তথ্যভিত্তিক প্রমাণের জন্য দুটি তালিকা দেওয়া হল।

বাসভাড়া

চেন্নাই —	০ - ৪ কিমি	২.০০ টাকা
	৪ - ৮	৩.০০
	৮ - ১০	৩.৫০
	১০ - ১৪	৪.০০
দিল্লি —	০ - ৪	৩.০০
	৪ - ৮	৪.০০
	৮ - ১২	৫.০০
কলকাতা —	০ - ৪	৪.০০
	৪ - ১২	৬.০০
	১২ - ২০	৭.০০

পরিবহন যাত্রী কমিটির পেশ করা রাজ্যভিত্তিক ন্যূনতম বাসভাড়ার তালিকা

তামিলনাড়ু	—	২.০০
মুম্বই	—	৩.০০
ওড়িশা	—	৩.৫০
আসাম	—	৩.০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	৩.০০
বিহার	—	৩.০০
দিল্লি	—	৩.০০
গুজরাট	—	১.০০
কর্নাটক	—	৩.০০
কেরালা	—	৩.০০
উত্তরপ্রদেশ	—	৩.০০
হরিয়ানা	—	৩.০০
পশ্চিমবঙ্গ	—	৪.০০

একই দামে তেল ও যন্ত্রাংশ কিনেও এবং সর্বাধিক যাত্রী পরিবহন করেও সর্বাধিক ভাড়া এই রাজ্যের মানুষকে দিতে হবে কেন তার কোন উত্তর নেই। প্রাণ হাতে করে যাত্রীদের যেতে হবে, আর শাসক দলের নেতারা ও তাদের আত্মীয়রা বাসের মালিক হয়ে বিপুল মুনাফা লুঠছেন, সরকারি পরিবহন ব্যবস্থাকে দুর্নীতির বন্যায় ডুবিয়ে দেবেন — তা মানুষকে মুখ বুজে মেনে নিতে হবে কেন?

বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষাও ব্যয়বহুল

মূল্যবৃদ্ধি আজ একটি সর্বাত্মক রূপ ধারণ করেছে। এর হাত থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য — এই জরুরি পরিষেবাগুলিও বাদ যায়নি। শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে যা যা করা দরকার, দেশের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিটি রাজ্য সরকার অতিদ্রুত করে দিচ্ছে। শুধু দেশের বাজারেই নয়, বিদেশের শিক্ষা-বাজারেও যাতে এ দেশের বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি প্রচেষ্টার কোন অন্ত নেই। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের

পুঁজিপতিদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বিদেশি পুঁজি এদেশে ঢুকতে এবং এদেশের পুঁজিপতিদের অন্য দেশে প্রবেশের রাস্তা সুগম করে দিতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে 'সার্ভিস' বা পরিষেবা কেনা-বেচার ক্ষেত্রের মধ্যে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লু টি ও'র বিধান অনুযায়ী পরিষেবা ক্ষেত্রও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা অবাধে চলতে পারে।

অথচ, ১৯৬৪ সালে সরকার নিযুক্ত কোঠারী কমিশন বলেছিল '..... ছাত্র বেতনকে আয়ের উৎস হিসাবে দেখা কোনমতেই কাম্য নয়। এটা রাজস্ব আদায়ের এমন একটি পদ্ধতি, যা সমাজকে পেছনে ঠেলে দেয়, যার চাপ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর উপরেই সবচেয়ে বেশি পড়ে এবং তা সমতার বিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ করে। .....আমরা তাই প্রস্তাব করেছি, দেশে ধীরে ধীরে এমন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সমস্ত স্তরের শিক্ষা হবে টিউশন ফি মুক্ত।'

শিক্ষাকে ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত করার সরকারি ভাবনা ৮০'র দশকে শুরু হলেও ৯০ দশকের গোড়ায় তড়িঘড়ি তা কার্যকর করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। আসলে এই সময়েই সরকার তথাকথিত নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতি চালু করে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে পরিষেবার সর্বক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করতে শুরু করে — যার অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ব্যাপক বেসরকারীকরণ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবসায়ীকরণ সহ সমস্ত ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি কার্যকর করতে শুরু করে। এই সময়েই শিক্ষা সম্পর্কে এতদিনকার ধারণাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা, আক্রমণে রূপান্তরিত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে যে গণতান্ত্রিক স্লোগান উঠেছিল 'শিক্ষার অধিকার - জন্মগত অধিকার' সেই দাবিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি পদদলিত করে বলতে শুরু করে — সব জিনিসের দাম বাড়ছে, শিক্ষার দাম বাড়বে না কেন? যেন শিক্ষাও আর পাঁচটা জিনিসের মতো একটা পণ্য — যার টাকা আছে সে কিনবে, যার নেই সে শিক্ষা পাবেনা। এর সঙ্গে 'সঙ্গতি' রেখেই বাজেটে শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ কমতে থাকে। সরকারি খরচ কমিয়ে, দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে শিক্ষার ব্যয়ের পুরো বোঝাটাই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণের

ঘাড়ে। ফর্মের দাম, টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি সহ নানা খাতে মোটা অঙ্কের ডোনেশন আদায়ের প্রথা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। চালু হয় সেল্ফ-ফিনানসিং কোর্স, অর্থাৎ কোন বিষয়ে পড়তে হলে তার সম্পূর্ণ খরচ ছাত্রছাত্রীদেরই বহন করতে হবে। চালু করা হয় ম্যানেজমেন্ট কোটা, এন আর আই কোটায় ছাত্র ভর্তির ব্যবসা। এ ধরনের প্রতিটি স্কিমই শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণের ক্ষেত্রে একেকটি বড় পদক্ষেপ। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় প্রাইমারি স্তরে বহু স্কুল বিলোপ করে, পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়ে, গ্রেডেশন প্রথা চালু করে শিক্ষাকে, শিক্ষার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম সরকারও বহুদিন আগেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাগত জানিয়েছে (সংবাদ প্রতিদিন ২৩.১০.০৫)। হরিণঘাটায় অনিল আম্বানীকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য সম্প্রতি তারা জমিও দিয়েছে। এরপর অন্যরাও এ রাজ্যে শিক্ষার বাজার লুটতে আসবে। সেই আসার কথাও সরকার জানিয়ে দিয়েছে। বেসরকারি মালিকানাধীন কলেজ কর্তৃপক্ষ মোটা মুনাফার জন্য ম্যানেজমেন্ট কোটা বা এন আর আই কোটা চালু করলেও দেশের কোন রাজ্যেই সরকারি কলেজে তা ছিল না। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকারই পথপ্রদর্শক। তারাই প্রথম সরকারি মেডিকেল কলেজে ১৫ শতাংশ এন আর আই কোটা চালু করেছিল, সেখানে জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এ সফল মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের বাদ দিয়ে প্রতিটি আসনে ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার বিনিময়ে সাধারণ মেধার ছাত্রদের ভর্তি করেছিল। যদিও মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার এবং এ আই ডি এস ও'র তীব্র আন্দোলন ও আইনি লড়াইয়ের ফলে পরাজিত হয়ে সরকারকে এন আর আই কোটা বাতিল করতে হয়েছে। শিক্ষায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি রূপায়ণের ফলে ছাত্রদের কাছ থেকে বিপুল ফি আদায়, সেল্ফ ফিনানসিং কোর্স, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, এডুকেশন লোন প্রভৃতি চালু করে ছাত্রদের আর্থিক দিক থেকে লুঠ করা হচ্ছে। চাকরির লোভনীয় সুযোগের নাম করে ইতিমধ্যেই বেসরকারি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং, বি এড, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্সের বহু ছাত্রকে সর্বস্বান্ত করে দেওয়া হয়েছে। টাকা খুইয়ে প্রতিশ্রুত চাকরি না পেয়ে সর্বস্বান্ত অনেক ছাত্রকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে এবং হচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া গরিবের অধিকার নয় — বড়লোকের 'সুযোগ'

শিক্ষার মতো 'টাকা দাও পরিষেবা নাও' — এই ব্যবসায়ী নীতি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও এ রাজ্যে অনেকদিন চালু হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্কের শর্তানুযায়ী সিপিএম সরকার এ রাজ্যে ১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে শুরু করে, জেলা সদর, মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত চার্জ ধার্য করে। 'ফ্রি বেড' কমিয়ে পেয়িং বেডের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিনা পয়সায় দেওয়া হতো এমন বহু জীবনদায়ী ওষুধ দেওয়া বন্ধ করা হয়। সিপিএম সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিধানসভায় 'প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ' পলিসি পাস করিয়ে নেয়। এর অর্থ সরকারি তদারকিতে ও পরিকাঠামোর ভেতরে পুঁজিপতিদের লুঠের ব্যবসা চালানোর সুযোগ দান। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এক হাজারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৬০টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২০০টি গ্রামীণ হাসপাতাল ও ১০,৩৫০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র অর্থাৎ প্রায় ১২,০০০ গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল বেসরকারি ব্যবসায়ী সংস্থাকে লিজ্ দেবে। অর্থাৎ জনগণের দেওয়া জমিতে জনগণের টাকায় গড়ে তোলা হাসপাতাল বেচে দেওয়া বা লিজ্ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, এই তুঘলকি অধিকার সিপিএম সরকারকে কে দিয়েছে? জনগণ, না জনগণের স্বাস্থ্যকে পণ্য বানিয়ে বিপুল পুঁজি খাটানোর বাসনায় বেপরোয়া অতি মুনাফালোলুপ পুঁজিপতিরা?

বেসরকারি হাসপাতালে গরিব কি চিকিৎসা পাবে?

হাসপাতাল একবার বেসরকারি হাতে চলে গেলে কি গরিব, সাধারণ ও গ্রামের মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাবেন? হাসপাতালকে বেসরকারি আওতায় আনার মানে হল সাধারণ মানুষ আর বিনাপয়সায় বা কম পয়সায় চিকিৎসার সুযোগই পাবেনা। কারণ সেখানে চিকিৎসা হবে বহুমূল্য, তার উদ্দেশ্য হবে মুনাফা। কিন্তু শুরুতে এক ধাক্কায় সমস্ত হাসপাতালগুলিকে বেসরকারি মালিকানাধীন করে দিলে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ শুরু হবে — এই আশঙ্কায় জনস্বাস্থ্যবিরোধী ধূর্ত সিপিএম সরকার ধাপে ধাপে এই পরিষেবাক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ করা শুরু করেছে। রাজ্যের প্রায় সমস্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তারা বেসরকারি সিটি স্ক্যান্ মেসিন বসানোর অনুমতি দিয়েছে এবং

এজন্য সরকারি হাসপাতালের জমি দিয়েছে; বাড়ি দিয়েছে। ফলে যথারীতি ব্যবসায়ীরা এরমধ্যেই রুগীদের পকেট কাটতে শুরু করেছে। সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন হাসপাতালে ক্লিনিং বিভাগ, রক্ষী বিভাগ, ডাইনিং বিভাগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে দিচ্ছে। নিরাময় পলিক্লিনিকের মত একটা নামী সরকারি স্বাস্থ্য সদন স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যাদবপুরে কে এস রায় হাসপাতালও এক অনাবাসী ভারতীয় স্বাস্থ্যব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের উদাহরণ আরো আছে। এইসব বেচাকেনায় শুধুমাত্র ব্যবসায়ীরা নয়, লাভবান হচ্ছে শাসকদলের কিছু নেতা ও বশংবদরা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে সিপিএমের প্রভাবশালী লোকজনেরা বা তাদের আত্মীয় স্বজনেরা এসব বেচাকেনায় কায়েমী স্বার্থ হিসেবে কাজ করছে। দেশের মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে যে তিমিরে ছিলেন তার চেয়েও ঘোরতর তিমিরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন।

শিল্পায়নের স্লোগান কেন মিথ্যাচার

প্রতিদিনের দুর্বিষহ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে দেশের গরিব সাধারণ মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি জোট সরকার ও বর্তমানে (কিছুদিন আগে পর্যন্ত সিপিএমের মদতপুষ্ট) কংগ্রেসী জোট সরকারের পথে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ফ্রন্ট রকারও দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণ-লুণ্ঠনের স্বার্থে জনগণের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছে। এমনিতেই সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি, বিপুল ছাঁটাই-ক্লোজার-বেকারি, ফসলের দাম না পাওয়া, তার উপরে শিক্ষা ও চিকিৎসায় ব্যাপক ব্যয়বৃদ্ধি, খাজনা ও ট্যাক্সবৃদ্ধি ইত্যাদি জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তার ওপর 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসাবে এসেছে উন্নয়ন ও শিল্পায়নের বুলি আওড়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের সিপিএম সরকার কর্তৃক লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমি ও বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত করা। রাজ্যের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী সভার পর সভায় নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলেছেন লক্ষ লক্ষ বেকার আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে — তাদের চাকরি দিতে হবে। কৃষিতে আমরা প্রথমে আছি — শিল্পেও আমরা প্রথম হব। সেইজন্য শিল্প চাই। কখনও হুংকার দিয়ে বলেছেন রাজ্যে শিল্পায়ন হবে, দেখি কে আমাদের আটকায়।

এখন গণআন্দোলনের ধাক্কায় দম্ভের বেলুন অনেকটা চুপসে গেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বহু এলাকায় সিপিএম ধরাশায়ী হবার পর নেতাদের সুর

অনেক নরম। হুংকারও চালাকির সঙ্গে কমে গেছে। নেতারা আপশোষ করে বলছেন, বেকারদের চাকরির জন্য তাদের মহৎ প্রচেষ্টাকে বিরোধীরা আটকে দিলেন। এটাও অনেকে বলছেন যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের বিরুদ্ধে গ্রামবাংলার মানুষের এই রায় প্রকৃত শিল্পায়নের বিরুদ্ধে নয়, তথাকথিত শিল্পায়নের বিরুদ্ধে এই রায়। মানুষ শিল্প বা শিল্পায়নের বিরুদ্ধে নয়। ঘটনা হলো, শিল্পায়নের নামে কংগ্রেস ও সিপিএম যে ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে মানুষ তা ধরে ফেলেছে এবং নির্বাচনে সেই ধাপ্পা ধরে ফেলে সিপিএমের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে। শিল্প হলে যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে শিল্প হোক এটাই সবাই চায়। শিল্পায়নের ফলে যদি বেকারদের চাকরি হয়, মানুষের দারিদ্র দূর হয়, খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ আরো বেশি করে মানুষের আয়ত্তে আসে তাহলে কেউই শিল্প গড়ে তোলার বিরোধিতা করে না। সকলেই, এমনকি গ্রামের কৃষকরাও চায় রাজ্যে হাজার হাজার কলকারখানা গড়ে উঠুক, যেখানে বেকাররা কাজ পাবে। কিন্তু শিল্প হচ্ছেটা কোথায়! শিল্প উঠে যাওয়াই এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে — শিল্পায়ন তো বহু দূর। হাজার হাজার কারখানায় লালবাতি জ্বলা আর লক্ষ লক্ষ ছাঁটাই এর পাশাপাশি একটা-দুটো শিল্পস্থাপনকে কি শিল্পায়ন বলা যায়? নাকি, শিল্পায়নের নামে বিশাল বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি, ফ্লাইওভার, সুইমিং পুল, মার্কেট, 'মল', হাসপবাতাল তৈরি বা নির্মাণ ব্যবসার প্রোমোটারি-ধোঁকার নাম 'শিল্পায়ন'। হাজার হাজার বন্ধ কারখানার পুঁজিকে এই ব্যবসায় ঢেলে স্থায়ী শ্রমিক না নিয়ে অতি মুনাফা করতে বেকারদের কিভাবে কর্মসংস্থান হবে? আর ৫৬ হাজার বন্ধ কারখানার ছাঁটাই লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সামনে ৩০/৩৫টা উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর নগণ্যসংনখ্যক কারখানা খোলাকে কি 'শিল্পায়ন' বলা চলে? না, সেখানে উল্লেখ করার মতো কর্মসংস্থান হবে! কিন্তু সিপিএম ও বৃহৎ পুঁজির মদতপুষ্ট প্রচারমাধ্যমগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এ দুটোকে এক করে দেখানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রকৃত শিল্পায়নের অর্থ হল, লাগাতার একের পর এক কল-কারখানা স্থাপিত হওয়া, ক্রমাগত কর্মসংস্থানের দ্বার খুলে দেওয়া। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে যখন পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল, তখন ইউরোপে এসেছিল সেই শিল্পায়ন বা শিল্প বিপ্লব। হাজার হাজার কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। সামন্তী কৃষি নির্ভরতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কলে, কারখানায় মানুষ কাজ পেয়েছিল। এটাই হল প্রকৃত শিল্পায়ন। ইউরোপের মতো

শিল্পায়ন এদেশে হয়নি। তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসনে ও স্বাধীনতার পর অল্প কিছুদিন সীমিতভাবে এদেশে শিল্প স্থাপন বা কর্মসংস্থান কিছুটা হয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ আজ আর নেই। কারণ পুঁজিবাদের নিয়মেই অতি মুনাফা মজুর-চাষী-নিম্নবিত্ত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মক নামিয়ে দেয়। নিয়ত পুঁজি বাড়ে, নতুন প্রযুক্তি আসে উৎপাদন বাড়ে অথচ সেই তুলনায় ক্রয়ক্ষমতাহীন নিঃস্ব মানুষ বাজারের চাহিদা বাড়াতে পারে না। এইটিই পুঁজিবাদের মূল সংকট। এজন্যই এখন প্রায় সর্বদাই বাজারে মন্দা ও শিল্পে লালবাতি জ্বলা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাস্তবকে চেপে দিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই করে হাজার হাজার শিল্প, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সিপিএম নেতারা তার জায়গায় দু-চারটি নতুন শিল্প (তাও উন্নত কম্পুটার প্রযুক্তি নির্ভর নগণ্যসংখ্যক শ্রমিকের ভিত্তিতে) শুরু হলেই তাকে শিল্পায়ন বলে ঢাক পিটিয়ে আর একটা ধোঁকা দিচ্ছেন।

তীব্র শিল্পসংকট পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে। পুঁজিবাদী বিশ্বে সর্বত্র আমরা এই তীব্র সংকটই প্রত্যক্ষ করছি। একসময় এ রাজ্যে গঙ্গার দুপাড়ে বহু কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। এখন সেসব জায়গা শ্মশানে পরিণত। দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। আজ থেকে ১৪ বছর আগে ১৯৯৪ সালের হিসাবেই রাজ্যের ৫৬ হাজারেরও বেশি ছোট বড় কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ১৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক কাজ হারিয়ে পথে বসেছে। একি শিল্পায়নের লক্ষণ? শুধু এ রাজ্যে নয়, সারা দেশে, সারা বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ শিল্প সংকট চলছে।

শিল্প-পণ্য কেনার লোক নেই অর্থাৎ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ লুণ্ঠনের পরিণামে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এমনি তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে যে শিল্পপণ্য জমে যাচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে না। ফলে এই বিশ্বব্যাপী মন্দা। বিক্রি না হলে বা কম বিক্রি হলে শিল্পপণ্য উৎপাদন করে মালিকের মুনাফা হবে কি করে? এই কারণেই বিদেশে ও এদেশে পুঁজিপতিরা-শিল্পপতিরা আগের মত হেভি ও ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে পুঁজি ঢালছে না। বিশ্বজুড়েই চালু কারখানাগুলো তারা বন্ধ করে দিচ্ছে। অবশিষ্ট যে কারখানাগুলো চালু রয়েছে, সেসবের পূর্ণ উৎপাদন করার ক্ষমতা বা ইনস্টলড্ ক্যাপাসিটি কমিয়ে আনা হচ্ছে। এখন তাদের প্রবণতা হচ্ছে, তাদের পুঁজি তারা বেশি করে ঢালছে শেয়ার বাজারের ফাটকা কারবারে, রিয়েল এস্টেট বা আবাসন-শপিং মল নির্মাণে, রাস্তা-ব্রীজ ইত্যাদি পরিকাঠামো নির্মাণে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্স ইত্যাদি পরিষেবা ও সুদের

ব্যবসায়। শিল্পে মারাত্মক মন্দার ফলে আবাসন সহ রাস্তা ফ্লাইওভার ইত্যাদির নির্মাণ কাণ্ডে বিপুল পুঁজি খাটানোর লোভনীয় সুযোগ নিতে বেপরোয়া পুঁজিপতিরা ক্ষমতাসীন সরকারকে কাজে লাগিয়ে কৃষি জমির উপর থাবা বসাচ্ছে। এজন্য গণহত্যা-ধর্ষণ-ফ্যাসীবাদী বীভৎস অত্যাচার করতে মদত দিচ্ছে। কোনও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরোয়া করছে না। এসব থেকেই বোঝা যায় শিল্প সংকট কি তীব্র আকার ধারণ করেছে।

যে মুষ্টিমেয় শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে সেগুলি উন্নত প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। পুঁজি নির্ভর শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারীর প্রয়োজন খুব কম। যে শ্রমিক কর্মচারীরা সেগুলোতে কাজ করছেন — তারা উন্নত প্রযুক্তির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই কম। দুনিয়াজোড়া এই পরিস্থিতিতে টাটা-জিন্দাল-আম্বানী বা কোনো মার্কিন, জাপান, জার্মান বা মালয়েশিয়ার কোম্পানি, যারা যেখানেই শিল্প কারখানা গড়ছে, সেখানেই তারা উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প করে কম শ্রমিক নিয়োগ করে মজুরি বাবদ খরচ কমিয়ে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করে তীব্র মন্দার বাজারে সর্বাধিক মুনাফা করতে চাইছে। এরাই নাকি পশ্চিমবঙ্গে এসে শিল্পায়নের জোয়ার বইয়ে দেবে এবং তাতে সাধারণ বেকার তরুণ-তরুণীদের ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে — এই প্রচার সিপিএম মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে যতই করা হোক না কেন — বাস্তবে এটা ডাহা মিথ্যাচার, তা বুঝতে কারোর এতটুকু অসুবিধা হয়না।

কৃষি সহায়ক শিল্প বা কৃষির উন্নতি কোনটাতেই সরকার নেই

কৃষিপ্রধান এই রাজ্যে কি ধরনের শিল্পস্থাপন করতে চাইছে সিপিএম সরকার? সেই শিল্পে কি কৃষি ও কৃষকের কোন উপকার হবে? কৃষকের উৎপাদনকে ভিত্তি করে কোন শিল্প, যেমন খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মত কৃষিভিত্তিক কোন ক্ষুদ্র শিল্প করার কি উদ্যোগ তারা নিচ্ছে? তা কিন্তু নিচ্ছে না। তারা মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প গড়তে চাইছে। এই চার চাকার ন্যানো গাড়ি, তা যত কম দামেই বিক্রি হোক্ দেশের ৮৫/৯০ ভাগ মানুষের কাছে তা কেনা দিবাস্বপ্ন। লাখ টাকার গাড়ি কিনবে ১০/১৫ শতাংশ উচ্চবিত্ত। সাধারণ মানুষ তা কিনতে পারবে না। টাকা কোম্পানি বাস্তবে সিঙ্গুরে 'ন্যানো' কারখানার নামে অন্য প্রদেশ থেকে তৈরি করা গাড়িডর যন্ত্রাংশ জুড়ে নেওয়ার ওয়ার্কশপ

করেছে। বাকি জমিতে বহু বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে শেয়ারে যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা ও অন্যান্য ব্যবসার জন্য হাজডার একর জমি সরকারি টাকায় প্রায় বিনামূল্যে উপহার পেয়েছে। এই চার ফসলি কৃষিজমির অনিচ্ছুক কৃষকদের পিটিয়ে, হত্যা ও ধর্ষণ চালিয়ে সিপিএম গোপন সুযোগ সুবিধা টাটার সঙ্গে আদানপ্রদান করছে। আর নন্দীগ্রামে তারা স্থাপন করতে চেয়েছিল 'কেমিকাল হাব' যেখানে যে কোন সময় বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যুদ্ধের মারণাস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করা যাবে। এসব শিল্প যে কতখানি ভয়ঙ্কর তা মধ্যপ্রদেশের ভুপাল গ্যাস দুর্ঘটনাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। কুখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান যে 'ডাও' কেমিক্যালসকে সিপিএম সরকার নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাবের জন্য ডেকে আনতে চেয়েছে, এদেরই বানানো ন্যাপাম বোমায় লক্ষ লক্ষ নিরীহ ভিয়েতনামের মানুষ প্রাণ হারায়। তাদের তৈরি এজেন্ট অরেঞ্জ নামক রাসায়নিক বিষে ভিয়েতনামের মাইলের পর মাইল উর্বর জমি বন্ধ্যা হয়ে যায়। বিদেশে এরকম অসংখ্য নজির আছে। এইসব শিল্পের সঙ্গে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকের স্বার্থের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। অথচ এই সব শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার কৃষকদের অত্যন্ত উর্বর কৃষিজমি তাদের ঘর-বাড়ি-স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল, মন্দির-মসজিদ সব কেড়ে নিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, গোটা রাজ্য থেকে সশস্ত্র ক্রিমিনালদের জড়ো করে মাসের পর মাস নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সিপিএম অত্যাচার চালিয়েছে, ক্রিমিনালদের দিয়ে লুঠতরাজ ধর্ষণ চালিয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস ও গণহত্যা করেছে। বহু কৃষক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন, আহত হয়েছেন কয়েক হাজার। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল, ক্রিমিনালদের ও ভাড়া করা পেশাদার খুনীদের পুলিশের পোষাক পরিয়ে, পুলিশের সঙ্গে একত্রে গণহত্যা ও দলবদ্ধ ধর্ষণ চালানো হয়েছে। এমনকি থানা পুলিশ ক্যাম্প সব নিষ্ক্রিয় করে হাজার হাজার সশস্ত্র সমাজবিরোধীদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিরস্ত্র জনগণের উপর। এ ধরনের ফ্যাসিবাদি তাণ্ডব এদেশে ইতিপূর্বে কোথাও হয়নি। এই নরক বানানোর কীর্তি কৃষকের ও কৃষির জন্য এদের উপহার। কৃষকের স্বার্থে বা কৃষির স্বার্থে এই সরকার কি কি করেছে? কৃষকদের এক ফসলি জমিকে কিভাবে দো ফসলি, বহু ফসলি করে তোলা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, সেচ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। রাজ্যের ৭০ শতাংশ জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে রাজ্য সরকার যতই প্রচার করুক, সবটাই ফোলানো

ফাঁপানো। রাজ্যে সেচের ব্যবস্থা আছে ৩০ শতাংশেরও কম জমিতে, যার বেশির ভাগটাই হয়েছে চাষীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই সেচের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম চাষীদের থেকে সরকার অনেক বেশি হারে আদায় করছে, যেখানে বহু রাজ্যে চাষীরা বিনাপয়সায় অথবা নামমাত্র মূল্য দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। এই রাজ্যে বিদ্যুতের দাম সর্বাধিক। চাষের বীজ, সার, কীটনাশক, সেচের জল কতটা সস্তা দরে কৃষকদের সরবরাহ করা যায় তার কোন চেষ্টাই সিপিএম সরকার করছে না। বরং বীজ, সার, কীটনাশক নিয়ে অসৎ ব্যবসায়ীদের ফাটকাবাজি সরকার বসে বসে দেখছে। দেশি-বিদেশি কৃষি পুঁজিপতিদের কবজায় এসে চাষের ব্যয়ভার হু হু করে বাড়ছে। আবার ব্যয়বহুল চাষের উপর উৎপন্ন ফসল বাজারে নিয়ে গেলে কৃষক মজুতদার, ফোড়ে-দালালদের ফাঁদে পড়ে ফসলের ন্যূনতম দামটুকু না পেয়ে চাষী সর্বস্বান্ত হচ্ছে। পরিণামে ঋণের ফাঁদে পড়ে এরাজ্যের আলুচাষী, পাটচাষী, করলাচাষীরা আত্মহত্যা করছে। সরকার কৃষকদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০১-২০০৫ সালে ভারতবর্ষে ৮৬,৯২২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। স্বামীনাথন কমিশন বলেছে ১০ বছরে দেড় লক্ষ কৃষক আত্মহত্যার পথ নিতে বাধ্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে যে চারটি প্রথম সারির শিল্প গড়ে উঠেছিল সেই চটকল, চাবাগান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও হোসিয়ারি শিল্পের সবগুলিই আজ প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কংগ্রেসের ধারাবাহিকতায় সিপিএম এ রাজ্যে শিল্প নিংড়ে মুনাফা করে তা ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে মালিকদের মদত দিয়েছে। চাবাগান সম্প্রসারণের নামে টি-ব্যারনরা জমি কুক্ষিগত করে এমনকি চা বাগান ধ্বংস করেও আবাসন ব্যবসা করে মুনাফা করেছে। ফলে চা বাগানগুলি ধুঁকছে। চা বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের বস্তিগুলিতে রেশন বন্ধ করেছে, বিদ্যুৎ বন্ধ করেছে এমনকি হাসপাতালে তালা ঝুলিয়েছে। হাজার হাজার চা শ্রমিক অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, মহামারীতে মৃত্যুর দিন গুণছে, এমনকী চা-শ্রমিক আত্মহত্যা করে প্রতিবাদ পর্যন্ত জানিয়েছে। তাতেও সিপিএম সরকারের নেতাদের নির্মম হৃদয়ে আঁচড় পড়েনি। মালিকদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনকে ভাঙ্গতে মালিক পক্ষের আক্রমণ নেমে আসে। মালিকের গুণ্ডারা চা শ্রমিকদের জনপ্রিয় যুব নেতা এস

ইউ সি আই কর্মী কমরেড তন্ময় মুখার্জীকে নৃশংসভাবে খুন করে।

বিদ্যুৎ এর মত পরিষেবার ক্ষেত্রকে ব্যবসাদারদের মুনাফার মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে

বিদ্যুৎ আধুনিক জনজীবনে অপরিহার্য এক পরিষেবা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য গবেষণা সমস্ত ক্ষেত্রই এই বিদ্যুৎ ছাড়া অচল। না লাভ, না ক্ষতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সরকারেরই। কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার আজ বিদ্যুৎকে পণ্যে পরিণত করে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বেসরকারি মালিকদের হাতে ধীরে ধীরে তুলে দিচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদকে কোম্পানি আইনের আওতায় এনে ভেঙ্গে তিনটি কোম্পানিতে পরিণত করেছে। একই বিদ্যুৎ শিল্পের তিনটি বিভাগ — উৎপাদন, সংবহন ও বন্টনকে তারা তিন টুকরো করেছে। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে বিদ্যুতের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে মালিকদের বিপুল মুনাফার সুযোগ করে দিচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ক্ষমতা (১৯,২৫০ মেগাওয়াট) চাহিদার (৪,৬০০ মেগাওয়াট) চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুনাফার স্বার্থে খরচ কমাতে পিক আওয়ারে উৎপাদন-ক্ষমতার চেয়ে কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। আবার খদ্দের পেলেই মুনাফার জন্য অন্য রাজ্যে বেশী দামে বিদ্যুৎ বিক্রি করা হচ্ছে। এজন্য দিল্লিতে একটা শেয়ার বাজারের ধাঁচে জাতীয় বিদ্যুৎবাজার তারা তৈরি করেছে। এর ফলে লোডশেডিং হচ্ছে। এই রাজ্যের কৃষক গৃহস্থ, মধ্যবিত্ত, খুচরো ব্যবসায়ী ও কুটির শিল্প সহ ছোট ছোট কারখানা মালিকদের ব্যবহার্য বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েই চলেছে সরকার। নিম্নবিত্ত মানুষরা তো অতিষ্ঠ এই মুনাফাসন্ধানী পরিচানায়। এর সঙ্গে আছে লোডশেডিংয়ের অসহনীয় চাপ। সরকারি মন্ত্রী এখন চালাকি করে বলছেন, এজন্যই পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চাই। চরম বিপজ্জনক এবং বহু উন্নত দেশ কর্তৃক পরিত্যক্ত পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এদেশে চালু করতে তারা তৎপর। সাথে সাথে পরমাণু সমঝোতার অজুহাতে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধজোটে তারা ভারতকে সামিল করছে।

বন্যা খরার প্রশ্নেও সিপিএম সরকার ক্রিমিনালের ভূমিকা নিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব জায়গায় ঘটে। কিন্তু আধুনিক যুগে, বিজ্ঞানের সাহায্যে যে কোন দায়িত্বশীল সরকার দুর্যোগের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে, উপযুক্ত

ত্রাণের ব্যবস্থা করে। এ রাজ্যে মানুষের অভিজ্ঞতা হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সরকার বলে যে কিছু একটা আছে তা বোঝাই যায় না। উত্তরবঙ্গে খরার আগুনে এক সময়ে শস্যক্ষেত্র দগ্ধ হয়েছে। চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। অথচ জলাধারে জলধারণের ব্যবস্থা থাকলে, সেচের জলের পর্যাপ্ত আধুনিক ব্যবস্থা থাকলে এমনটা ঘটতো না। এমনকি অনাহারক্লিষ্ট মানুষকে খাদ্যদ্রব্য সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় রিলিফ দেওয়ার ন্যূনতম দায়িত্বও সরকার পালন করেনি। আবার দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ে হাজার হাজার ঘরবাড়ি ভেসে গেল, লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হল। অথচ এই সর্বনাশ হতো না যদি মজা নদী, খাল নিয়মিত সংস্কার করা হতো, বাঁধগুলি মজবুত থাকতো বা বাঁধগুলি সংস্কার করে জলধারণের ক্ষমতা বাড়ানো হত এবং জল নিকাশীর বন্দোবস্ত থাকতো। কিন্তু কে করবে? বন্যার স্থায়ী সমাধানে সরকারের আগ্রহ আছে কিনা তা নিয়ে, যারা প্রতি বছর বন্যাকবলিত হন, তাঁদের মনে গভীর সন্দেহ আছে। বরং টোটকা চিকিৎসার মতো বাঁধ মেরামতের নামে শত শত কোটি টাকা কন্ট্রাক্টর পোষার দুর্নীতি এবং রিলিফের নামে প্রতি বছর দলবাজি দুর্নীতিই যেন সরকারি নীতি। স্থায়ীভাবে বন্যা প্রতিরোধের সামগ্রিক কোন মাষ্টারপ্ল্যানও নেই, অথবা টাকার অভাবের কথা বলে তা এড়িয়ে যাওয়া হয়। যারা টাটা-বিড়লা-জিন্দাল-সালেমদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত, তারা গরিব গ্রামবাসীদের চোখের জলের হিসাব নেবে কি করে? নামমাত্র যতটুকু রিলিফের ব্যবস্থা তারা করেছে তার বণ্টন নিয়েও হয়েছে চরম দুর্নীতি ও দলবাজী। ফলে গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষ, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভাগচাষীদের ওপর নেমে এসেছে এক ভয়াবহ অনিশ্চিত ভবিষ্যত ক্ষুধা ও দারিদ্রের নিষ্ঠুর চাবুক।

শ্রমিক কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকার ওপর চরম আক্রমণ নেমে এসেছে

শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবন ও জীবিকাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ ও প্রতিদিনই এর সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বায়নের সর্বনাশা নীতি অনুসরণ করে সরকার শ্রমআইনটুকু পর্যন্ত তুলে দিতে চাইছে। কর্মহীন অগণিত বেকার বাহিনীর সাথে প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছে কর্মরতদের কর্মহীন হওয়ার সংখ্যা। সরকারি ক্ষেত্রগুলিতে নতুন নিয়োগ বন্ধ। লক্ষ লক্ষ স্থায়ীপদ অবলুপ্ত হচ্ছে। অল্প শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়ে বেশি কাজ করানো হচ্ছে। ৮ ঘণ্টার আন্তর্জাতিক

স্বীকৃত শ্রম সময় আজ সারা দেশে (এ রাজ্যে তো বটেই) উঠে যাওয়ার মুখে। ১০/১২ ঘণ্টা খাটানো হচ্ছে অবাধে। কর্মী ও কর্ম সংকোচন, ঠিকা ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও আউট সোর্সিং ব্যাপকভাবে বাড়ছে। কি সরকারি কি বেসরকারি সর্বক্ষেত্রেই তা ঘটছে। নিয়োগপত্র, কাজের সময়, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প এবং লেবার ল বা শ্রমআইন মানার কোন বালাই রাখা হচ্ছে না। শ্রমিকদের বহু কষ্টার্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো দায়িত্ব এড়াতে চাইছে। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। এ রাজ্যে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ৭৭ টাকা দৈনিক। বাস্তবে কৃষি, চাবাগান, বিড়ি শ্রমিক সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের কয়েক কোটি শ্রমিক এর অর্ধেকের মতো মজুরি পায়। জনসাধারণের অর্থে লালিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরগুলি বাস্তবে মালিকের স্বার্থে পুরোপুরি কাজ করছে। শত শত কোটি টাকা পি এফ এবং ই এস আই বাবদ অনাদায়ী থাকলেও মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা শ্রম দপ্তর বা সরকার করছে না। সরকার এখানে পরিকল্পিতভাবে নিষ্ক্রিয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য 'সামাজিক সুরক্ষা বিল ২০০৭' আজও সংসদে বিবেচনাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থার কর্মীদের বেতন পুনর্বিন্যাসের দাবি দীর্ঘদিন বকেয়া পড়ে আছে। গ্রামীণ ডাক-সেবক কর্মীদের নিয়মিতকরণ ও সামাজিক প্রকল্পের অধীনে আনার দাবি আজও অপূরিত। এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের কিছু বেতন বাড়িয়ে সরকার শ্রমিক দরদী সাজতে চাইছে। শ্রমিক কর্মচারীদের ওপর এই সর্বাত্মক আক্রমণ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারী ও সাধারণ মানুষকেই সংগঠিতভাবে দাঁড়াতে হবে। কেন্দ্র-রাজ্য কোন সরকার বা নির্বাচনসর্বস্ব দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি দলগুলো জনগণের পাশে দাঁড়াবে না। মালিকশ্রেণীর স্বার্থে দেশের আইন কানুন ও বিচারব্যবস্থাকেও যেভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে তাতে শ্রমিক কর্মচারীরা আইনি সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এই বঞ্চনা ও দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস দীর্ঘদিনের।

সমস্ত দিক থেকে মানুষের বাঁচার পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ রাজ্যে বেকার সংখ্যাও সিপিএম সরকার কারচুপি করে কম দেখাচ্ছে। আসলে বেকার অনেক বেশি। রাজ্যের বেকার সংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষ

লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কর্মচ্যুত। একদা শিক্ষায় দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে থাকা পশ্চিমবঙ্গ এখন প্রায় শেষের ধাপে। দেশের মধ্যে এ রাজ্য এখন নারী পাচারে প্রথম স্থানে। নারী ধর্ষণে দ্বিতীয় স্থানে, শিশু শ্রমিকেও প্রথম সারিতে। সর্বস্ব খুইয়ে হাজার হাজার গ্রামবাসী ও শহরের শ্রমিক এখন ফুটপাথে বা ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। হাজারে হাজারে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। অনেকে আত্মহত্যা করে নিজেকে, নিজের পরিবারকে শেষ করে দিচ্ছে। এ রাজ্যে বিগত ৫ বছরে কয়েক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে শহরের রাস্তার মোড়ে, গঞ্জের ধারে স্টেশনে হাজার হাজার অসহায় মা-বোনেরা দেহবিক্রির জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এ রাজ্যে বধূহত্যা, নারী নির্যাতন, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি বেড়েই চলেছে। মেয়ে পাচার ও চুক্তিতে (সুপারী) খুনী এ রাজ্যের সবচেয়ে লাভজনক ঘৃণ্য পেশা। এসব যদি উন্নয়নের নিদর্শন হয় তাহলে বলতেই হবে সিপিএম রাজত্বের দৌলতে এ রাজ্যের যথেষ্ট উন্নয়ন হচ্ছে।

সর্বাঙ্গীণ এই দুঃসহ পরিস্থিতির জন্য যেমন মূল দায়ী দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তথা মুনাফালোলুপ পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনীতি, তেমনই সেই কাঠামোকে কোটি কোটি দেশবাসীর উপর চাপিয়ে রাখার ও পরিচালনা করার কাজে লিপ্ত যে সব রাজনৈতিক ম্যানেজারেরা, তাদের প্রভুদের স্বার্থ দেখার জন্য প্রতিটি জনবিরোধী পদক্ষেপ এবং তাদের দুর্নীতি ও হৃদয়হীন ক্ষমতা-লালসাও কম দায়ী নয়। এদের বিরুদ্ধে যথার্থ জনজাগরণ ও গণআন্দোলন ছাড়া জনগণের বাঁচার উপায় নেই। এসবের বিরুদ্ধে যাতে প্রতিবাদ ধ্বনিত না হয়, আন্দোলন সংগঠিত না হয় তার জন্য একদিকে পুঁজিপতিরা, অন্যদিকে তাদের পলিটিকাল ম্যানেজার কংগ্রেস-বিজেপির মত সিপিএমও মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে, বিবেক-নীতি-নৈতিকতা বর্জিত করে যৌবনের শক্তিকে তারা ধ্বংস করতে চাইছে। তাদের মতলব হল, মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করো, স্বার্থপর করো, দেদার লাইসেন্স দিয়ে মদের দোকান বাড়াও, চলচ্চিত্র-সাহিত্যে যৌনতার ব্যাভিচার ছড়াও, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের 'জীবনশৈলী' শিক্ষার নামে জীবনধ্বংসকারী ব্যাভিচারি যৌনতার উন্মাদনায় ভাসিয়ে দাও; এইডস্ প্রতিরোধের ধুয়ো তুলে পথে ঘাটে কুৎসিৎ যৌন বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দাও। অন্যদিকে এদেশের বিগত যুগের প্রেরণাদায়ী মহৎ চরিত্রগুলির চর্চা থেকে ছাত্র যুবকদের দূরে সরিয়ে

রাখতে তারা প্রাণপণ সচেষ্ট। এমনকি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, ক্ষুদিরাম, নেতাজী, ভগৎ সিংদের চরিত্রকে বিকৃত মসীলিপ্ত করেও তারা এই ষড়যন্ত্র করে চলেছে। এই সমাজবিধ্বংসী ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে না পারলে প্রতিটি পরিবার তো বিপন্ন হবেই দেশ ও সমাজ বিপন্ন হবে। দরদী মরমী মন, নিঃস্বার্থ উদার চেতনা, স্নেহ মমতা, প্রেম সহ সংবেদনশীল সমস্ত সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে নষ্ট করে দিয়ে উন্মত্ত স্বার্থপরতা, ধান্ধাবাজি, চালাকি বাড়ানো হচ্ছে। তাই উদার মহৎ উন্নত চরিত্রের অনুশীলন আজ অত্যন্ত জরুরি। তাই রাজনীতিকেও বর্তমান নীতিহীন নীচতা থেকে মুক্ত করতে হবে।

শাসকরা নয়, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেষ কথা বলবে জনগণ

আপনারা জানেন আমাদের দল এস ইউ সি আই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলছে। গড়ে তুলছে উন্নত সাংস্কৃতিক সামাজিক আন্দোলনের পরিপূরক নৈতিকতার ব্যাপক চর্চা। চরিত্রের চর্চা। নির্বাচন সর্বস্ব অন্যবিরোধী দলের আন্দোলনের মহড়ার সঙ্গে আমাদের দলের পরিচালিত আন্দোলনের পার্থক্য নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য করেছেন। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চেতনায় ও সংহত শক্তিতে জনগণকে জাগ্রত করার লক্ষ্য নিয়েই আমাদের আন্দোলন। পুরনো পলিটিকাল ম্যানেজারদের বদলে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী নতুন পলিটিক্যাল ম্যানেজার হয়ে গদী দখলের জন্য আমরা রাজনীতি বা গণআন্দোলন করি না। তাই আমাদের দল ভোটের দিকে তাকিয়ে আন্দোলন করে না। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শোষিত সর্বহারা দরিদ্র দুঃখী মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মার্কসবাদী উচ্চ নৈতিকতা আমাদের রাজনীতির ভিত্তি। বৈপ্লবিক লক্ষ্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সংগ্রামী রাজনীতি ও উন্নত সংস্কৃতির ভিত্তিতে জনগণের সংগ্রামী হাতিয়ার গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করেই আমাদের দল আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করে।শুধু পার্টিকর্মী সমর্থকদের সম্মিলিত আন্দোলন নয়, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গণকমিটির মাধ্যমে গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টায় আমাদের দল ব্যাপৃত।

খাদ্য-শিক্ষা-চাকরি সবই এখন সংকটে। জনজীবন বিপর্যস্ত। কেন এই

অবস্থা? এর কারণ হল পুঁজিবাদী শোষণ। পুঁজিবাদ থাকলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ হতে পারেনা। বেশিরভাগ মানুষের খাদ্য জুটতে পারে না। শিক্ষা-স্বাস্থ্য দুর্মুল্য হবে, সমাজের নৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। কাজেই পুঁজিবাদের অবসান চাই। সেজন্য চাই বিপ্লবী গণআন্দোলন। যার পাদপীঠ হিসাবে আজ এলাকায় এলাকায় জনগণকে জড়িত করে গণকমিটি গঠন করে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এইসব গণকমিটিগুলি হবে জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার। গণকমিটি মানে উপরতলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ নয় — জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি। সর্বনিম্ন স্তর থেকে জনগণের চিন্তা করার, ঠিক বেঠিক নির্ধারণের ক্ষমতা অর্জন ও রাজনৈতিক দলগুলির নীতি ও পদক্ষেপ বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও তাকে কার্যকর করার মাধ্যমে 'জনগণের রাজনৈতিক শক্তি' গড়ে তোলার জন্য এই গণকমিটি। আর সাহসী, সৎ, নিঃস্বার্থ যুবশক্তিকে নিয়ে তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। গণকমিটিগুলিতে দলের নেতারা সব ঠিক করে দেবেনা — জনগণ বিচার বিবেচনা করে ঠিক করবে, সক্রিয় উদ্যোগ নেবে। এ ধরনের গণকমিটি ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। গণআন্দোলনের এই ধারণা এদেশে নিয়ে এলেন মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। আমাদের দল তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। কিছুটা সফল হয়েছে নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক মহান কৃষক সংগ্রামে। তিনি শিখিয়েছেন, আন্দোলনকে তেমনভাবে শক্তিশালী করার জন্য গড়ে তুলতে হবে ভলান্টিয়ার বাহিনী। যারা সাহসের সাথে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তাহলে, সরকারে যেই থাক, তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন চেতনা, নতুন চরিত্র গড়ে তুলে দুষ্ট রাজনীতির অবসান ঘটানো সম্ভব হবে। এ জন্য চাই জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত করে শাসকদের চরিত্র ও শোষকশ্রেণীর চরিত্র চেনানো। রাষ্ট্রশক্তির শ্রেণীচরিত্র ও এদের ঘোষিত গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা চেনানো এবং এই পথেই বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজমুক্তির উন্নত আদর্শ চেনানো। এবং আজকের যুগের সেই আদর্শ হ'ল বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ভিত্তিতে বিকশিত, বিশেষীকৃত ও সমৃদ্ধ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। কখনোই প্রতিষ্ঠিত সমাজশক্তির জোরে বাতিল কোন আদর্শকে চাপিয়ে দিয়ে বা কারুর

মনগড়া কোন বাণী দিয়ে একটা যুগের সমাজ পরিবর্তন হতে পারে না। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দিয়েই তা সম্ভব। আজকে গণআন্দোলনে যাঁরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে চান তাঁরা নিজেরা যদি মার্কসবাদী নাও হন, তাহলেও মার্কসবাদবিরোধী হলে চলবে না। আজকের কোন মহৎ আন্দোলনকেও বা সমাজপরিবর্তনের উপযোগী কোন গণআন্দোলনকেও আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা দিয়েই গড়ে তুলতে হবে। না হলে তা সঠিক পরিণতি পাবে না — জনগণকে আবার ঠকতে হবে — আন্দোলনকে পুঁজি করে নতুন শাসক আসবে, মুক্তি আসবে না।

একথা ঠিক, এই রাজ্যের ক্ষমতাসীন সিপিএম দলের নীতি, পদক্ষেপ ও নেতাদের চরিত্র ব্যাপক জনগণের মনে যে ক্ষোভ ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে, তাকেই ব্যবহার করে পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থেই তাদের প্রভাবিত মিডিয়াকে দিয়ে মার্কসবাদবিরোধী জিগির তোলাচ্ছে। তারাই সিপিএমকে মদত দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে ও বহাল রেখেছে। আবার তারা জানে, এরা প্রকৃত মার্কসবাদী নয়। মার্কসবাদ শব্দটি সিপিএম নেতাদের ও দলের লোকঠকানো মুখোশমাত্র। আর এটাও জানে প্রকৃত মার্কসবাদ তাদের নিধনের একমাত্র হাতিয়ার বা সত্যিকারের আদর্শ। সিপিএম দলের সাইনবোর্ডে যেহেতু মার্কসবাদ শব্দটি আছে — তাই এই সুযোগে ব্যাপক মানুষের সিপিএম বিরোধী ঘৃণা ও ক্ষোভকে পুঁজিপতিরা ও তাদের অর্থপুষ্ট মিডিয়া মার্কসবাদবিরোধী হুজুগে পরিণত করতে মরিয়া হয়েছে। এবিষয়ে সতর্ক না থাকলে জনগণের শত্রু শয়তান শোষকদের ফাঁদে পা দিয়ে তাদেরই হাড়িকাঠে বলি হতে হবে। এই চেতনাই সঠিক ও গণমুক্তির উপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিপ্লবী গণসংগ্রামের জন্ম দেবে। একমাত্র এইপথেই মানুষ বাঁচতে পারবে। তাই শাসকদল ও বাণিজ্যিক সংবাদপত্রের আন্দোলন-বিরোধী প্রচারের জবাব পাল্টা যথার্থ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই দিতে হবে। আসুন, আগামী প্রজন্মের জীবনকে সহজ সুগম করতে আমরা সেই গণআন্দোলনের পতাকাতলে এগিয়ে আসি।

——

‘‘মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ, মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে।’’

— শিবদাস ঘোষ